BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03100026

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 10| October 2025| e-ISSN: 2584-1890

মনোরমা : দুই পরস্পরবিরোধী মূর্তির অপূর্ব সমন্বয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনব সৃষ্টি

Sutapa Singha Mahapatra

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi

Abstract

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'মৃণালিনী'-র কেন্দ্রীয় চরিত্র মনোরমা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অন্যান্য নারী চরিত্রের মতোই অসামান্য সুন্দরী, স্বাধীনচেতা, শিক্ষিত এবং গল্পের প্রোটাগনিস্ট। মনোরমা চরিত্রটি দুই পরস্পরবিরোধী মূর্তির অপূর্ব সমন্বয়ে গঠিত। এক মূর্তিতে সে আনন্দময়ী, সরলা বালিকা; অন্য মূর্তিতে সে গম্ভীরা, তেজস্বিনী, প্রতিভাময়ী, প্রখরবুদ্ধিশালিনী। তার বয়স সম্পর্কে উপন্যাসে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও, আনুমানিক পনেরো থেকে আঠারো বছরের মধ্যে হওয়ায় সে বাল্য ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে অবস্থান করে। স্বামীসঙ্গ সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং সংস্কারবর্জিতা ও স্বাধীনভাবাপন্না প্রকৃতির কারণে তার মধ্যে বালিকাসুলভ সারল্য, ভয়হীনতা এবং কপালকুণ্ডলার সঙ্গে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বিধাতা-নির্ধারিত দিবসে তার স্বামী পশুপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে মনোরমা নিজেকে বিধবা বলেই জানত। এই সময় থেকেই সে প্রেমের বৈধতা-অবৈধতা নেই বলে বুঝেছিল। পরে পশুপতিকে পাপকার্য থেকে নিরস্ত করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সে তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে। জ্যোতিষীর গণনাকৃত ভবিষ্যৎ অখণ্ডনীয় জেনেও সে নীরবে সেই দিনটির প্রতীক্ষা করত, যেদিন তার জন্য শ্মশানভূমিতে বাসরশয্যা রচিত হবে। অসহ্য দহন জ্বালা ও সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতার কারণে মনোরমা মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয় এবং এক স্বপ্নময় জগতে বিচরণ করে।

Key Words: *বঙ্কিমচন্দ্র, উপন্যাস, মৃণালিনী, নারী চরিত্র, মনোরমা।*

Introduction:

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে কাহিনির বিন্যাস ঘটে সাধারণত একটি নারী চরিত্রকে ঘিরে। অর্থাৎ নারী চরিত্রগুলিই তাঁর উপন্যাসে প্রোটাগনিস্ট চরিত্র। তাই প্রত্যেকটি চরিত্র এক-একটি বিশেষ গুণসম্পন্ন হয়ে আখ্যানে অবতীর্ন হন। তারা অসামান্য সুন্দরী, স্বাধীনচেতা, শিক্ষিত এবং গল্পের নিয়ন্ত্রক এবং সে-যুগের তুলনায় অনেক এগিয়ে। 'মৃণালিনী' উপন্যাসের (১৮৬৯) সূচনা 'প্রাবৃটকাল, কিন্তু আকাশে মেঘ নাই'[১], -যেন বর্তমান দিনের আবহাওয়া ঘোষণা। বঙ্কিমচন্দ্র বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয় নামক জাতীয় কলঙ্ক বিশ্বাস করতেন না বলেই এই 'মৃণালিনী' উপন্যাসের আয়োজন। উপন্যাসের 'মনোরমা' চরিত্রটি যেন- "নবীন সূর্যোদয়ে সদ্য প্রফুল্লদলমালাময়ী নলিনীর প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য সুকুমার।"[২] মনোরমার বালিকাসুলভ সারল্য, তার ভীতিহীন নৈশভ্রমণ কপাকুণ্ডলাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু উভয় চরিত্রের পার্থক্যও লক্ষণীয়। যে মূর্তিতে মনোরমা হেমচন্দ্রকে প্রথম সম্ভাষণ করল, যে মূর্তিতে নিস্তব্ধ নিশীথে হেমচন্দ্র তার সাক্ষাৎ পেলেন, সে মূর্তি কপালকুণ্ডলার পরিচিত। কিন্তু যে মূর্ত্তিতে প্রগলভা মনোরমা হেমচন্দ্রের নিকট প্রেমের গূঢ় ব্যাখ্যা করছে, সে মূর্তিতে কপাকুণ্ডলার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

Discussion:

ঔপন্যাসিক মনোরমার সৌন্দর্য অন্যতম পুরুষ চরিত্র হেমচন্দ্রের চোখ দিয়ে বর্ণনা করেছেন এইভাবে-

> "হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন, দেখিয়া প্রথম মুহূর্তে তাহার বোধ হইল, সম্মুখ একখানি কুসুমনির্ম্মিতা দেবীপ্রতিমা। দ্বিতীয় মুহূর্তে দেখিলেন, প্রতিমা সজীব; তৃতীয় মুহূর্তে দেখিলেন, প্রতিমা নহে, বিধাতার নির্ম্মাণকৌশলসীমারূপিণী বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী।"[৩]

তীক্ষ্মধী পশুপতি মনোরমার মনোরমার স্বরূপ এবং দুই পরস্পরবিরোধী মূর্তির অপূর্ব সমন্বয় এইরূপ বিশ্লেষণ করেছেন-

> "তোমার দুই মূর্ত্তি- এক মূর্তি আনন্দময়ী, সরলা বালিকা- ...সেইরূপে আমর হৃদয় শীতল হয়। আর তোমার এই মূর্ত্তি গম্ভীরা তেজস্বিনী প্রতিভাময়ী প্রখরবুদ্ধিশালিনী- এ মূর্ত্তি দেখিলে আমি ভীত হই।"[৪]

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাকে প্রহেলিকা বলেই মনে হয় এবং তার বিচিত্র বাল্য ইতিহাস ও তার জীবনের উপর নিয়তির ক্রুর দৃষ্টি তাকে অধিকতর প্রহেলিকাময়ী করে তুলেছে। মনোরমার চরিত্রে বিরুদ্ধ গুণাবলীর সমন্বয় কীভাবে সম্ভব হল তা বুঝতে হলে, এককথায় তার চরিত্র বুঝতে হলে, তার বয়স সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বঙ্কিম স্পস্টত কিছু উল্লেখ করেননি। আনুপূর্বিক তার জীবন যেমন একটা হেঁয়ালি, তার বয়সের প্রশ্নও কতকটা তেমনিই হেঁয়ালি। বঙ্কিম যা লিখেছেন তা এইরূপ-

> "মনোরমার বয়ঃক্রম যথার্থ পঞ্চদশ, কি ষোড়শ, কি তদধিক, কি তন্ন্যূন, তাহা ইতিহাসে লেখে না, পাঠক মহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন।"[৫]

পৃথিবীতে এমন অনেক বিষয় আছে যার সম্বন্ধে ইতিহাস স্পস্টতঃ কিছু না লিখলেও এমন কিছু উপকরণ রেখে যায়, যার উপর নির্ভর করে অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রেও বঙ্কিম যে সকল উপকরণ রেখে গিয়াছেন তা থেকে মনোরমার বয়স মোটামুটি অনুমান করা চলে। পশুপতির যখন বিবাহ হয়, তখন তিনি যুবক এবং হৈমবতী (মনোরমা) অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা। আখ্যায়িকায় বর্ণিত ঘটনাকালে পশুপতির বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর। যৌবনকাল অনেক বড় সময়, এটা দ্বারা বিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত যেকোনো বয়স বোঝাতে পারে।

কিন্তু আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, বিবাহকালে পশুপতি ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণপুত্র এবং পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি গৌড়ের ধর্মাধিকার। তিনি যতই প্রতিভাশালী হন না কেন, কপর্দকহীন ভাগ্যান্বেষীর পক্ষে সাত-আট বৎসরের পূর্বে এরূপ সম্মান লাভ করা সম্ভব নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় এই সম্মান লাভ করতে পশুপতির সাত থেকে দশ বৎসর লেগে থাকবে, তাহলে বিবাহকালে তার বয়স দাঁড়ায় পঁচিশ থেকে আঠাশের মধ্যে এবং এই হিসাব অনুসার উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাকালে মনোরমার বয়স দাঁড়ায় আনুমাণিক পনের থেকে আঠারোর মধ্যে। অর্থাৎ বয়সে মনোরমা বাল্য ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে এবং তার চরিত্রে এই উভয়কালের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই বয়সে বিবাহিতা নারীকে যুবতী এবং কুমারীকে বালিকা বলে অভিহিত করা চলে। বিবাহের পর মনোরমা যদি সাধারণ রমণীয় ন্যায় স্বামীর গৃহে প্রতিষ্ঠিত হত, তাহলে বয়ঃপ্রপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্রে বালিকাসুলভ বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা যুবতীসুলভ বৈশিষ্ট্যই অধিক প্রকাশ পেত। কিন্তু ভাগ্যদোষে মনোরমা স্বামীসঙ্গ সুখ থেকে বঞ্চিত।

সুতরাং স্বামীর গৃহে নারী স্বভাবতই যে শিক্ষা লাভ করে, যে শিক্ষা বালিকাসুলভ চাঞ্চল্য সংযত করে বালিকা বয়সেই নারীকে প্রবীণা করে তোলে, সে শিক্ষালাভের সুযোগ সে পায়নি। উপরন্তু মনোরমা বাল্যেই মাতৃহীনা। সুতরাং বুদ্ধিমতী মাতার নিকট কন্যা অনুড়া অবস্থাতেও যে শিক্ষা লাভ করে, তাও তার অদৃষ্টে জোটেনি। পরে পিতার মৃত্যুর পর সে যখন পিতামহতুল্য বৃদ্ধ জনার্দ্দন শর্মার আশ্রয়ে এল, তখন সংসারে অনভিজ্ঞ, সরলপ্রাণ ব্রাহ্মণ দম্পতির সান্নিধ্য যেকোনোরূপ সাংসারিক শিক্ষার অনুকূল হয়নি, একথা নিঃসংশয়ে অনুমান করা চলে। মনোরমা স্বভাবতঃ স্বাধীনভাবাপন্না ও ভয়শূন্যা, এবং শিক্ষার াভাবে সে অনেকটা সংস্কারবর্জিতা। এই কারণেই কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তার কিছু কিছু সাদৃশ্য অনুভূত হয়। অনেকটা সংস্কার বর্জিতা বলেই

অপরিচিত হলেও হেমচন্দ্রের সঙ্গে আচরণে তার কোনো সঙ্কোচ নেই। আবার স্বভাবগুণে স্বাধীন মনোভাবাপন্না ও ভয়শূন্যা বলে একাকী আসতে সাহসী হয় না, মনোরমা প্রতিরাত্রে সেখানে সরোবর জলে অবগাহন করতে শঙ্কাবোধ করেনি।

কিন্তু স্বভাবগুণে ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে মনোরমার চরিত্র একদিকে যেভাবেই বিকাশ লাভ করুক না কেন, বয়সে মনোরমা যৌবনের কোঠায় না হলেও অন্ততঃ সীমানায় এসে পৌঁছে গেছে। প্রকৃতির শিক্ষা মানুষের অপেক্ষা রাখে না। যে যাদুকরীর যাদুপ্রভাবে নব বসন্তে প্রতি বৃক্ষ নবকিশলয়ে সজ্জিত হয়, উল্লসিত বিহঙ্গকণ্ঠের কাকলি বাতাস মুখরিত করে তোলে, সেই যাদুকরীই একদিন মনোরমার কানে কান জানিয়ে দিল যে, তার জীবনেও বসন্তের সমাগম হয়েছে। কিন্তু কোথায় সে দেবতা, যার অভ্যর্থনার জন্য মনোরমার জীবনে এই বসন্তোৎসবের আয়োজন ? হৈমবতীর পিতা অদৃষ্টদেবতাকে ফাঁকি দিতে গিয়ে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার জীবন নিয়ে যে প্রহসনের অভিনয় করেছিলেন, জ্ঞানহীনা বালিকার নিদ্রালু নয়নে তা একটা কিছু নূতন রকমের খেলা বলেই অনুমিত হয়ে থাকবে। ক্ষণিকের স্মৃতি ক্ষণিকেই মিলিয়ে গেল। হৈমবতীর অশুভ গ্রহ তার পিতার সমস্ত চেষ্টাকে বিদ্রূপ করে মনোরমার পশ্চাদনুসরণ করল।

এখানে একটা প্রশ্ন এসে পড়ে- পশুপতি যে তার স্বামী একথা মনোরমা জানল কবে ? এ প্রশ্নের উত্তরও ইতিহাসে লেখা নেই। সুতরাং এক্ষেত্রেও অ্যাখ্যায়িকার মধ্যে যতটুকু উপকরণ পাওয়া যায় তাকেই ভিত্তি করে কল্পনার সাহায্যে ইতিহাস গড়ে নিতে হবে। আখ্যায়িকায় মনোরমাকে পশুপতির সম্মুখে দেখতে পাই পর পর দুই রাত্রিতে। প্রথম রাত্রির সংলাপ থেকে তার পূর্বে মনোরমা নিজের সত্যকার পরিচয় জানত কিনা সে সম্বন্ধে কোনো কিছু অনুমান করা চলে না। দ্বিতীয় রাত্রিতে দেখতে পাই মনোরমা পশুপতির নিকট নিজের পরিচয় দিল। তবে কি প্রথম রাত্রে পশুপতির নিকট থেকে বিদায় নেবার পর ও দ্বিতীয় রাত্রে তার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে কোনো সময় সে তার প্রকৃত পরিচয় পেয়েছে ? এ প্রশ্নের উত্তর মনোরমার উক্তি থেকেই অনুমান করে নিতে হবে। মনোরমা পশুপতিকে বলেছে-

> "একদিন (জনার্দ্দন শর্ম্মা) গোপনে ব্রাহ্মণীর নিকট প্রকাশ করিতেছিলেন। আমি দৈবাৎ গোপনে শুনিয়াছিলাম।"[৬]

মনোরমা যদি সেই দিন অথবা তার পূর্ব রাত্রিতে পশুপতির থেকে বিদায়ের পর তার অতীত ইতিহাস শুনে থাকে, তা হলে এই স্থলে 'একদিন' -এই উক্তির কোনো তাৎপর্য্য থাকে না। পক্ষান্তরে, পশুপতি যখন তাকে প্রশ্ন করলেন-

> "মনোরমা- রাক্ষসী ! এতদিন কেন আমাকে এ অন্ধকারে রাখিয়াছিলে ?"[৭]

-এটার উত্তরে সে অন্যান্য কারণের সঙ্গে এ কথারও উল্লেখ করতে পারত যে, তার অতীত জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে তার পরিচয় 'এতদিনে'র -অর্থাৎ দীর্ঘদিনের নয়।

সুতরাং বুঝতে হবে যে, মনোরমাকে যখন আখ্যায়িকার মধ্যে পশুপতির সংস্পর্শে দেখতে পাই তার পূর্বেই সে সকল তথ্য অবগত হয়েছে। কিন্তু তা মনোরমা রূপে পশুপতির সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের পূর্বে ? নাকি পরে ? সন্দেহকাতর হেমচন্দ্র যখন মনোরমার প্রশ্নের উত্তরে দারুণ অভিমানে বললেন-

> "আমি মণি ভ্রমে কালসাপ কণ্ঠে ধরিয়াছিলাম, এখন তাহা ফেলিয়া দিয়াছি।"[৮]

তখন তাকে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে মনোরমা যে সকল কথার অবতারনা করল, তা থেকে অনুমান করা চলে যে, পশুপতির সঙ্গে প্রথম পরিচয়কালে সে নিজেকে বিধবা বলেই জানত। পুরাণোক্ত ভাগীরথী-মৃত্যুঞ্জয়-ঐরাবত কাহিনীর ব্যাখ্যা মনোরমা সুপণ্ডিত পশুপতির নিকট যেরূপ শুনেছে, হেমচন্দ্রের নিকট ঠিক সেইরূপ ব্যাখ্যা করেছে -একথা সত্য, কিন্তু অন্তর মধ্যে সে এটার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিল বলেই এটা তার মর্ম স্পর্শ করেছে।

অষ্টমবর্ষীয়া হৈমবতী যেদিন মনোরমায় রূপান্তরিত হল, সেদিন সে শুনল তার পূজার নৈবিদ্যের ডালি পূর্ণ হবার পূর্বেই কে জানে কোন দেবতার অভিসম্পাতে উচ্ছিষ্ট হয়ে গিয়েছে। যে বয়সে নব নব আশা ও আকাঙ্ক্ষা তরুণ মনকে আবেগ-চঞ্চল করে তোলে, সে বয়সে মনোরমা পেল ব্যর্থতার দুঃসহ জ্বালা, তার অন্তর জুড়ে উঠল করুণ আর্তনাদ। তারপর, অদৃষ্ট দেবতার

নির্ধারিত দিবসে তার চোখের সম্মুখে এসে দাঁড়াল তার ভাগ্যনিয়ন্তা-হৈমবতীর স্বামী পশুপতি। মনোরমা নিজেকে বিধবা জেনেই পশুপতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। আকৃষ্ট হয়েই বুঝেছিল-

> "তুমি বালির বাঁধ দিয়া এই কূলপরিপ্লাবনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি তুমি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের বেগ রোধ করিতে পারিবে না।"[৯]

সুতরাং, শাস্ত্রজ্ঞ পশুপতি যখন তাকে বোঝালেন যে, বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়, মনোরমা তখন সহজেই তাকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হল। তারপর যেদিন সে তার প্রকৃত ইতিহাস শুনল, সেদিন তার মনে হল, দেবতা সাক্ষী করে একদিন সে যার গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছিল, মন তাকেই নিজের বলে চিনে নিল, এটার মধ্যে দেবতার কোনো নিগূঢ় ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রকৃত তথ্য অবগত হয়েও মনোরমা কেন পশুপতিকে অন্ধকারে রেখেছে, পশুপতির প্রশ্নের উত্তরে তা সে নিজেই ব্যক্ত করেছে। মনোরমা বিধবা বলে পরিচিত, সহসা হৈমবতী বলে নিজের পরিচয় দিলে পশুপতি হয়ত সে কথা বিশ্বাস করতেন না। এটা ছাড়াও জ্যোতির্বিদের গণনা তার নীরবতার অন্যতম কারণ। ভবিষ্যৎ হয়ত অখণ্ডনীয়; কিন্তু অনাগত ভবিষ্যৎ আশঙ্কার কথা প্রকাশ করে মনোরমা কেন পূর্বাহ্নেই তার স্বামীর মনের শান্তি নষ্ট করবে ? জ্বলতে হয়, সে একাই জ্বলবে। তাই পশুপতি যখন রাজ্যেশ্বর হবার সুখস্বপ্ন দেখেছেন, মনোরমা তখন নীরবে সেই দিনটির প্রতীক্ষা করেছে, যেদিন শ্মশানভূমিতে তার জন্য অভিনব বাসরশয্যা রচিত হবে।

জ্ঞান হওয়া অবধি অসহ্য দহন জ্বালা মনোরমার নিত্য সহচর। প্রথমে বৈধব্য জ্বালা, পরে দৈবক্রমে যেদিন নিজের পরিচয় পেল, সেদিন থেকে জ্যোতির্বিদের গণনা বিধাতার অবিশাপের ন্যায় তার পশ্চাদনুসরণ করেছে। অথচ কোনো অবস্থাতেই সে এমন কোনো সঙ্গিনী পায়নি, যার নিকট দুঃখের কথা বলে সে বুকের বোঝা কিঞ্চিৎ হালকা করতে পারে। মনোরমা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ বলেই নির্জন প্রকৃতি তাকে আকর্ষণ করে। নিত্য রাত্রে জনহীন পথপার্শ্বে ভয়সঙ্কুল সরোবর তাকে আহ্বান করে এবং সরোবরের শীতল জলে আবগাহন স্নান করে শুধু যে তার গাত্রজ্বালাই নিবারিত হয় তা নয়, শান্ত স্নিগ্ধ প্রকৃতির ক্রোড়ে আশ্রয় নিলে হয়ত তার প্রাণের জ্বালাও কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়।

বস্তুতঃ, কত বড় ব্যথার বোঝা কাঁধে নিয়ে তাকে তার নিঃসঙ্গ দিনগুলি কাটাতে হয়েছে তা স্মরণ করলে আপাতদৃষ্টিতে তার বিসদৃশ আচরনের মধ্যে সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। মনোরমা অনেক সময় আত্মবিস্মৃত হয়ে যেন এক স্বপ্নময়জগতে বিচরণ করে। এই কারণেই স্বভাবতঃ প্রখর বুদ্ধিশালিনী হলেও কোনোরূপ কঠিন আঘাতে মর্তে নেমে না এলে আমরা তার সরস্বতী মূর্ত্তির পরিচয় পাই না। পশুপতির সঙ্গে আচরণে তার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। হেমচন্দ্রও যে একবার তার প্রতিভাময়ী মূর্তির পরিচয় পেলেন, তার মূলে এই যে, এই সময় তার প্রণের ব্যথা সহনুভূতিশীলা মনোরমার অন্তরের এক স্পর্শকাতর গোপনতন্ত্রীতে আঘাত করে তাকে মুখর করে তুলেছিল। পশুপতি হয়ত তার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য জানতেন এবং এই কারণেই বিবাহ সম্বন্ধে তার সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে যখন দেখলেন যে- সে চিত্ত হারিয়েছে, তখন তার বুদ্ধি প্রদীপ জ্বালার উদ্দেশ্যে ভয়সূচক চিন্তার আবির্ভাবে কার্যসিদ্ধ হবে -এইরূপ ভেবে তার নিকট যবনের প্রসঙ্গ তুললেন। তার চেষ্টা যে ফলবতী হল না, এটার কারণ মনোরমা আর নিজের অশুভকে ভয় করে না, তার যা কিছু ভাবনা পশুপতিকে নিয়ে। সাম্রাজ্যলোভে তিনি যে আজ নিম্নগামী হয়েছেন, এটা তার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে ছাপিয়ে উঠেছে। মনোরমা যে কখন কখন কতখানি আত্মবিস্মৃত হত এইখানেই তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাই।

পূর্বরাত্রে পশুপতিকে তার পাপ অভিসন্ধি থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টায় ব্যর্থকাম হয়ে সে যে তার নিকট নিজের যথার্থ পরিচয় দেবার সঙ্কল্প নিয়েই দেবীমন্দিরে তার অপেক্ষা করছিল, এটা তার পরবর্তী আচরণ থেকে সহজেই অনুমিত হয়। কিন্তু পূজাবশিষ্ট পুষ্পগুলি নিয়ে বিনাসূত্রে মালা গাঁথতে গাঁথতে এক অতকিত মুহূর্তে মনোরমা আত্মবিস্মৃত হল। পশুপতি এসে তাকে সম্বোধন করলে কোনো উত্তর দিল না, হয়ত তার প্রশ্ন তার কানে পৌঁছাল না। পশুপতি যখন দ্বিতীয়বার তাকে আহ্বান করলেন, মনোরমা মুখ তুলে পশুপতির প্রতি চেয়ে রইল। হয়ত যে কথাটি বলবার জন্য এতক্ষণ বসে রয়েছে, ভুলে যাওয়া সেই কথাটি স্মরণ করতে চেষ্টা করল-

"পশুপতির মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, ক্ষণেক পরে কহিল, আমি তোমাকে কি বলিতে আসিয়াছিলাম, কিন্ত তাহা আমার মনে হইতেছে না।"[১০]

পশুপতি বসে রইলেন, মনোরমা মালা গাঁথতে লাগল। গাঁথতে গাঁথতে পুনরায় সে পশুপতিকে, তার নিজেকে বিস্মৃত হল। তার হাত দু'খানি তখন যেন যন্ত্রের ন্যায় মালা গেঁথে চলেছে, মনোরমা যেন তখন কোনো দূর স্বপ্নলোকে- সেখানে পশুপতি নেই, কেশবের কন্যা নেই, পশুপতি ও কেশবের কন্যার জীবনে বিধাতার অভিসম্পাতের জ্বালা নেই। পশুপতি অনেকক্ষণ নীরব থেকে পরে অনেক কথা বাললেন। কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে বললেন সে তা শুনল কিনা সন্দেহ। তিনি যখন বোঝাচ্ছিলেন যে, কুলরীতি শাস্ত্রমূলক নয়, মনোরমা তখন বিনাসূত্রের মালা একটি কৃষ্ণবর্ণ মার্জারের গলায় পরাচ্ছিল। পরাতে গিয়ে মালা খুলে গেলে মনোরমা নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে আবার মালা গাঁথতে লাগল। তাকে প্রকৃতিস্থ করার পশুপতির সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল।

মালা গাঁথা শেষ হলে, মনোরমা পুনরায় তা মার্জারের গলায় পরাতে গেল। পশুপতি তাকে বিবাহে রাজি কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে মনোরমা মালা ও মার্জার নিয়ে ব্যস্ত থাকল, পশুপতির কথায় কর্ণপাত করল না। মার্জারের সৌভাগ্যের সঙ্গে নিজের দুর্ভাগ্যের তুলনা করে পশুপতি খানিক ক্রোধান্বিত হয়ে আর সইতে না পেরে মার্জারটিকে চপেটাঘাত করলেন। বেচারা মার্জার নিজের অপরাধ বুঝুক আর না বুঝুক, তৎক্ষনাৎ পলায়ন করে আত্মরক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করল। মনোরমা হাসতে হাসতে হাতে থাকা মালাটি পশুপতিকেই পরিয়ে দিল। চিত্রটি অর্থপূর্ণ; বঙ্কিম এস্থলে পশুপতির মার্জারোচিত আচরণের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। কিন্তু মনোরমার দিক দিয়ে তার আচরণ জ্ঞানহীন শিশুর আচরণের ন্যায় সম্পূর্ণ অর্থহীন। মনোরমার ক্ষেত্রে এটার ফল হল এই যে, যবনের আগমনের আশঙ্কা যা নিষ্পন্ন করতে পারেনি, পশুপতির অনুচিত আচরণ তাই নিষ্পন্ন করল। পশুপতিকে বাহুপ্রসারণ করতে দেখে পথিক যেমন দূরে দাঁড়ায়, সেইরূপ দাঁড়াল। পশুপতি যখন দোষস্খালনের চেষ্টা করলেন, মনোরমা তেজোদৃপ্ত মূর্তিতে তার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে বলল- "পশুপতি। কেশবের কন্যা কোথায় ?"[১১]

মনোরমার অবস্থায় পড়লে মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হওয়া সাধারণ কথা, উন্মাদগ্রস্ত হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। তার প্রথম দর্শনে তার কথার প্রণালীতে হেমচন্দ্রের মনে প্রশ্ন জেগেছিল- "এ কি অলৌকিক সরলা বালিকা ? না উন্মাদিনী ?"[১২] মনোরমা নিজেও স্থানান্তরে উন্মদিনী বলে নিজেকে সম্বোধন করেছে হেমচন্দ্রের সামনে। কিন্তু সত্যই সে উন্মাদিনী নয়। এত ব্যথা বুকে চেপে রেখেও সে যে উন্মাদিনী না হবার কারণ তার বয়স তার অনুকূল। বয়সে মনোরমা বাল্য ও যৌবনের সীমান্ত প্রদেশে দাঁড়িয়েছিল বলেই অতি সহজেই সে যৌবনের প্রতিভাময়ী প্রখর বুদ্ধিশালিনী মূর্তি পরিত্যাগ করে অবিকৃতা বালিকার সাজে সাজতে পারত এবং সেই সঙ্গে তার সকল চিন্তা যেন কোনো যাদুপ্রভাবে অন্তর্হিত হত। এইরূপ রূপান্তরণ যেন অনেকটা তার ইচ্ছাধীন -বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ ইঙ্গিত করেছেন। হেমচন্দ্রকে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রেমের ধর্ম কীর্ত্তন করতে করতে নিজের অজ্ঞাতেই মনোরমা তার নিকট হৃদয়ের দ্বার কতকটা উন্মুক্ত করে ফেলেছে। হেমচন্দ্র যখন প্রশ্ন করলেন-

"তুমি বিবেচনা করিয়া বল দেখি, তুমি যদি ধর্ম্মে একের পত্নী, মনে অন্যের পত্নী হইলে, তবে তুমি দ্বিচারিণী হইলে কি না ?"[১৩]

-তখন সে বুঝল যে, সে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে পড়েছে।

মনোরমার চরিত্রের এই বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে তার কাহিনী সম্বন্ধে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত যে সকল অসঙ্গতির উল্লেখ করেছেন, সে সকলের সহজ মীমাংসা হয়ে যায়। তিনি অনুমান করেন যে মহম্মদ আলির সঙ্গে পশুপতির মন্ত্রণার পর মনোরমা তার প্রকৃত পরিচয় জেনে থাকবে। কারণ-

"তাহা না হইলে সে বহু পূর্বেই পশুপতিকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিতে পারিত। যখন সে শুনিয়াছে তাহার পর প্রথম অবসরে সে পশুপতিকে জানাইয়া নিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছে।"[১৪]

এটার পরই তিনি প্রশ্ন করেছেন-

"অপরাহ্নে সে হেমচন্দ্রকে বুঝাইল যে প্রেমের বৈধতা অবৈধতা নাই, প্রেম গঙ্গা প্রবাহস্বরূপ, সুতরাং অপ্রতিরোধনীয় ও পবিত্র এবং তাহার কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইল যে ইহা তাহার নিজের অভিজ্ঞতার

ফল। অথচ সেই দিন রাত্রিতেই সে প্রমাণ করিয়া দিল তাহার প্রেম বিশুদ্ধ, বৈধ প্রেম। তবে কি মনোরমা প্রথম হইতেই জানিত যে সে পশুপতির স্ত্রী এবং তাহা জানিয়াই কি সে প্রণয়ের প্রতিদান দিয়াছে ?"[১৫]

-এইরূপ অনুমান করায় যে সকল অসুবিধা রয়েছে তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি বলেছেন-

"এইরূপ মনে করিলে মনোরমার অধিকাংশ কথা ও কার্য্য তাৎপর্য্যহীন হইয়া পড়ে এবং মনোরমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হইয়া যায়।"[১৬]

অর্থাৎ, তাঁর মতে মনোরমার কাহিনীর বিভিন্ন অংশ পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের পরিপোষক এবং কোনো সিদ্ধান্তকেই অসংশয়ে গ্রহণ করা চলে না। কিন্তু-

(১) মনোরমা পশুপতিকে ভালবাসে, তার পক্ষে পশুপতিকে পাপকার্য্য থেকে নিরস্ত করার চেষ্টার পক্ষে এটাই পর্যাপ্ত কারণ, আত্মপরিচয় জানা না-জানার সঙ্গে এটাকে সম্বন্ধযুক্ত থাকতে হবে -এমন নয়। পক্ষান্তরে, মনোরমার পক্ষে প্রকৃত পরিচয় দিয়ে পশুপতিকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা অধিকতর ফলবতী হতে পারে -এরূপ সম্ভাবনা থাকলেও, পরিচয় দেওয়ার পথে যে সকল অন্তরায় রয়েছে সে সকলের আলোচনা করলে প্রথম অবসরে সে পশুপতিকে জানিয়ে নিবৃত্ত কারতে চেয়েছে -এরূপ অনুমানের কারণ থাকে না এবং মনোরমার নিজের উক্তি ('একদিন' সে এই কাহিনী শুনেছে) এরূপ অনুমানের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। যখনই সে তার কুমন্ত্রণা সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছে, অর্থাৎ, মহম্মদ আলির সঙ্গে তার গোপন ষড়যন্ত্র জানতে পেরেছে, তখনই, আত্মগোপন করলেও প্রথম অবসরে সে তাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছে এবং অকৃতকার্য হয়ে (অবশ্য এটার জন্য তার নিজের দুর্বলতাও কিছুটা দায়ী) শেষ উপায় হিসাবেই দ্বিতীয় রাত্রে সে আত্মপরিচয় দিয়েছে।

(২) মনোরমা হেমচন্দ্রকে প্রেম সম্বন্ধে যা কিছু বুঝিয়েছে, সে সমস্তই তার নিজের অভিজ্ঞতার ফল -এটা সুনিশ্চিত। কিন্তু সকল অভিজ্ঞতাই যে একই সময় অর্জিত হয়েছে -এরূপ মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। মনোরমা হয়ত নিজেকে বিধবা মনে করেই পশুপতির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে এবং তখনই বুঝেছে -এরূপ মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। মনোরমা হয়ত নিজেকে বিধবা মনে করেই পশুপতির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে এবং তখনই বুঝেছে যে প্রেমের বৈধতা অবৈধতা বলে কিছু নেই।

হয়ত একই সময় পশুপতি তাকে বুঝিয়েছে যে, প্রেম পবিত্র। কিন্তু এই বাণী তার অন্তরে তখনই পরিপূর্ণ সাড়া দিয়াছে যখন পরবর্তী কোনো সময় সে জেনেছে যে- যাকে সে না চিনে ভালবেসেছে, সে-ই তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী। অর্থাৎ, হেমচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনাকালে মনোরমা নিজেকে পশুপতি স্ত্রী বলে জানলেও, এটা থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, প্রথম থেকেই সে তা জানত।

Conclusion:

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তার প্রথমোক্ত অনুমানের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ মহম্মদ আলির সঙ্গে পশুপতির মন্ত্রণার পর মনোরমা তার প্রকৃত পরিচয় পেয়েছে -এই অনুমানের ভিত্তিতে মনোরমার জীবনে তিনটি সুনির্দিষ্ট ভাগ লক্ষ্য করেছেন-[১৭] (১) পশুপতির সঙ্গে প্রণয় ও বিশ্বাসঘাতকতায় সম্মতি, (২) হৈমবতীর ইতিহাস শ্রবণ, (৩) পশুপতিকে নিরস্ত করার বিফল চেষ্টা ও জ্যোতির্বিদের গণনার সফলতা। কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আবশ্যিক। মনোরমার জীবনের তিনটি সুনির্দিষ্ট ভাগ এইরূপ হওয়া উচিত- (১) নিজেকে বিধবাজ্ঞানে পশুপতির সঙ্গে প্রণয়, (২) হৈমবতীর ইতিহাস শ্রবণ করে পশুপতির থেকে তা গোপন রাখা এবং পশুপতিকে নিবৃত্ত করবার প্রথম ব্যর্থ প্রয়াস, (৩) পশুপতির নিকট পরিচয় প্রদানের পর তাকে নিরস্ত করার দ্বিতীয় ব্যর্থ প্রয়াস ও জ্যোতির্বিদের গণনার সফলতা -এইরূপ ভাগ করলে তার কাহিনীতে কোথাও কোনো অসঙ্গতি থাকে না, মনোরমার কথাও কার্য তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে না এবং তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হয় না।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। (১৯৫৯)। মৃণালিনী, আদিত্য প্রকাশালয়, পৃষ্ঠা- ১

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৭

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৬

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৮

৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৬

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৫

৭. পূর্বোক্ত

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮১

৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮১-৮২

১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০১

১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৪

১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৭

১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৪

১৪. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র। (১৩৫২)। বঙ্কিমচন্দ্র, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স লিঃ, পৃষ্ঠা- ৯৮

১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৮-৯৯

১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৯

১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৮

Citation: **Singha Mahapatra. S.,** (2025) "মনোরমা : দুই পরস্পরবিরোধী মূর্তির অপূর্ব সমন্বয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনব সৃষ্টি", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-10, October-2025.